একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

The lives of lower-caste refugees, victims of partition, in Bengali literature

বাংলাসাহিত্যে দেশভাগের বলি নিম্নবর্ণীয় উদ্বাস্তু জনজীবন

Name of the Author: **Dr Pinaki Biswas**

Affiliation: **Assistant Professor, Galsi Mahavidyalaya affiliated to The University of Burdwan, West Bengal, India**

Abstract: The common masses became victims of the power-hungry mentality of leaders over a long period. By instilling religious sentiments (Hindu and Muslim faiths) and breaking down social relationships between people, these leaders succeeded in deeply embedding the idea of "Hindustan-Pakistan" into the very marrow of the populace. Therefore, even though the British handed over the administration to Indians, the common people did not attain true freedom. Instead, millions were rendered destitute by this Partition; a curse descended upon their fates. Even many aristocratic Hindus had to leave their country with nothing but the clothes on their backs and become slum-dwellers in India. They had to lose their kin. As for the plight of the common lower-class Hindus, there was no end to it. That chapter of poverty, insult, and humiliation was so tragic that an epic novel could have been written about it, but it wasn't. There are many reasons why it didn't happen. No significant movement was organized against the Partition either. The conspiracy of Partition was executed at a time when most people had no time to think about it; "Independence" was the most important thing to them then. Those Bengalis who did not have to migrate did not personally experience the pain and agony of displacement, so they felt no obligation toward it. However, the number of writers and literati who did personally experience migration was not small. Yet, the volume of literature on this subject remains relatively low. Muslim writers from East Bengal wrote some literature about Partition. Some writers from Western India produced works in English, Urdu, and Hindi. But despite the abundance of fiction writers, poets, playwrights, and essayists in West Bengal, the tragedy of Partition and the refugee problem did not find much space in their writings. Did this massive disaster of the Bengali Hindus silence them? In reality, there might have been restrictions. Many inhibitions, hesitations, and fears were at work in the minds of the writers. Avoiding those, whatever literature was produced in Bengali regarding the experience of Partition mostly spoke of the upper and middle-class refugees—those who were landlords, lawyers, solicitors, doctors, or teachers in East Bengal. But literature about the lowest strata of refugees and the insecurity of their lives was hardly written at all. Those who wrote about Partition were from the middle-class Hindu Bengali society. The lower-class Bengalis had not yet advanced in education at that time; therefore, despite suffering the most wretched conditions, they could not document this tragic history themselves. In the creative works of the middle-class intelligentsia, the refugee crisis and the consequences of Partition appeared indirectly in many places, but perhaps they hesitated or faced obstacles in portraying that terrifying time directly and openly. Amidst all this, the stories of lower-caste Hindus found a place in only a few instances. I am attempting to discuss the few mentions that exist in literature regarding the pain of this class of people.

Keywords: Partition, Refugees, Minorities, Power-hungry, Religious sentiment, Lower-class Hindus, Two-nation theory

বাংলাসাহিত্যে দেশভাগের বলি নিম্নবর্ণীয় উদ্বাস্তু জনজীবন

ড. পিনাকী বিশ্বাস

ভূমিকা:

'Partition was dificult to forget but dangerous to remember' - উর্বশী বুটালিয়া।

১৯৪৭ সাল, ১৫ই আগস্ট, দেশভাগের মধ্যে দিয়ে ইংরেজ শাসনভার হস্তান্তর করল ভারতীয়দের হাতে। বেশিরভাগ মানুষের মনে এক অন্য অনুভূতি- স্বাধীনতার অনুভূতি। কিন্তু দেশভাগের ফলে যাদের জন্মভূমি, বসতবাড়ি, সম্পদ সব ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, তাদের মনে তো স্বাধীনতা বলে আলাদা কোনো স্বস্তির অনুভূতি ছিল না। দেশভাগের ফলে বিরাট ডামাডোল ও বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হ'ল ভারত- পাকিস্তানের মুসলিম-হিন্দু সংখ্যালঘু জনতাদের মধ্যে। কেউই জন্মভূমি ত্যাগ করে যেতে চায় না। দীর্ঘদিন ধরে নেতাদের ক্ষমতালোভী মানসিকতার স্বীকার হল সাধারণ জনতা। দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় বোধের (হিন্দু ও মুসলিম ধর্ম) দ্বারা মানুষে-মানুষে সামাজিক সম্পর্কের ভাঙন ধরিয়ে হিন্দুস্তান-পাকিস্তান আইডিয়াকে ভাল করে রক্তমজ্জায় মিশিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন সেইসব নেতারা। সুতরাং ভারতবর্ষের মানুষদের হাতে ইংরেজ শাসনভার হস্তান্তর করলেও স্বাধীনতা সাধারণ মানুষ পেল না। বরং এই দেশভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিঃস্ব হয়ে গেল। তাদের ভাগ্যে অভিশাপ নেমে এল। অনেক অভিজাত হিন্দুদেরও এক কাপড়ে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে এসে হতে হয়েছে বস্তিবাসী। হারাতে হয়েছে স্বজনকে। আর সাধারণ নিম্নবিত্ত হিন্দুর দূরবস্থার তো শেষই ছিল না। দারিদ্র্য, অপমান ও লাঞ্ছনার সেই অধ্যায় অত্যন্ত মর্মান্তিক, যা নিয়ে একটা মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস লেখা হতে পারত কিন্তু হয়নি। কেন হয়নি তার অনেক কারণ আছে। দেশভাগ নিয়ে তেমন কোনো আন্দোলনও সংঘটিত হল না। এমন এক লগ্নে দেশভাগের চক্রান্ত করা হল যখন বেশিরভাগ মানুষের ভাবার সময় নেই দেশভাগের বিষয় নিয়ে। 'স্বাধীনতা'ই তাদের কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তখন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে বাঙালির মনে যে ক্ষোভ ও তার ফল হিসাবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনে ব্রিটিশরা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয়েরা যেভাবে ভারতকে ভাগ করল, বাংলাকে ভাগ করে পাকিস্তানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করল এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন দানা বাঁধল না, বরং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের সময়ে যে বাঙালিরা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল সেই বাঙালিদেরকেই পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তিকে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে দেখা গেল। এর কারণ কী এ প্রশ্ন আমাদের মনে কি জাগে না? দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে হিন্দু মুসলিম নেতারা দেশভাগ করে

দেশনায়ক হবেন, আর সাধারণ মানুষ তার ভিটেমাটি ছেড়ে পথের ভিখিরি হবে- এ নিয়ে নেতাদের কোনো ভাবনা বা দ্বিধা ছিল বলে মনে হয় না। অন্নদাশংকর রায়ের ছড়ায় তিনি লিখেছেন - "তেলের শিশি ভাঙলো বলে / খুকুর পরে রাগ করো,/ তোমরা যে সব বুড়ো খোকা / ভারত ভেঙে ভাগ করো / তার বেলা?" না, তার বেলা কোনো দোষ নেই। দেশভাগের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের সেদিনকার দূরবস্থা নিয়ে যত সংখ্যক সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। দ্বিজাতিতত্ত্বের দোহাই দিয়ে দেশভাগের যে আগুন নিয়ে খেলেছিল দেশনায়করা তাতে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাঙালি হিন্দুরা এবং তাদের মধ্যে একেবারেই সহায় সম্বলহীন উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছিল নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরা, যাদের একমাত্র জীবিকা ছিল কৃষি। বাংলায় এত শিল্পী সাহিত্যিক থাকা সত্ত্বেও এই শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যরচনার উদ্যোগ দেখা যায়নি। যেসব বাঙালিদের দেশত্যাগ করতে হয়নি তাদের তো জীবনে প্রত্যক্ষভাবে দেশত্যাগের বেদনা ও যন্ত্রণা আসেনি তাই এ নিয়ে তাদের দায়ও ছিল না। কিন্তু নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে দেশত্যাগ করে এরকম লেখক সাহিত্যিকের সংখ্যাও তো কম ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে সাহিত্যের সংখ্যা তুলনায় খুবই কম। পূর্ববঙ্গের মুসলিম সাহিত্যিকরা কিছু কিছু সাহিত্য লিখেছেন দেশ বিভাগ নিয়ে। পশ্চিমভারতের কিছু সাহিত্যিকরা ইংরেজি, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় কিছু সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু যে সংখ্যক কথা-সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার, প্রবন্ধিকের আধিক্য পশ্চিমবাংলায় ছিল অথচ তাঁদের কলম নিঃসৃত সাহিত্যে দেশভাগ এবং উদ্বাস্তু সমস্যা তেমন কিছু পাওয়া গেল না। তাহলে বাঙালি হিন্দুর এই বিরাট বিপর্যয় কি তাঁদের স্তব্ধ করে দিয়েছিল? আসলে বিধিনিষেধ হয়তো ছিল। অনেক বাধা-দ্বিধা-ভয় সাহিত্যিকদের মনে কাজ করছিল। সেসব এড়িয়ে বাংলায় দেশভাগের অভিজ্ঞতা বিষয়ে যতটুকু সাহিত্য রচিত হয়েছে, সেখানে লেখা হয়েছে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তুদের কথা। পূর্ববঙ্গে যারা জমিদার, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, মাস্টারমশাই ছিলেন – তাদের কথা। কিন্তু একেবারে নিম্নস্তরের উদ্বাস্তুদের নিয়ে এবং তাদের জীবনের বিপন্নতা নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়নি বললেই চলে। যারা দেশর্ভাগ নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁরা বাঙালি হিন্দুদের মধ্যস্তরের মানুষ। নিম্নস্তরের বাঙালিরা তখনও শিক্ষা-দীক্ষায় এগোতে পারেনি। তাই তারা সবথেকে বেশি দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে পড়া সত্ত্বেও এই মর্মান্তিক ইতিহাস নিয়ে তারা সাহিত্য রচনা করতে পারেনি। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টিতে উদ্বাস্তু সমস্যা ও দেশভাগের পরিণতির কথা অনেক জায়গাতে পরোক্ষভাবে এসেছে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে খোলসা করে সেই ভয়ংকর সময়কে তেমনভাবে দেখাতেই হয়তো তাদের দ্বিধা ছিল কিংবা কোনো বাধা ছিল। এরই মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় ঠাঁই হয়েছে নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের

কথা। যে সামান্য উল্লেখ এই শ্রেণীর মানুষদের বেদনা নিয়ে সাহিত্যে আছে তারই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

শশিভূষণ ঠাকুর ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলদের মত নিম্নবর্গের নেতারা পূর্ববাঙ্গে নিম্নবিত্ত মুসলিমদের সঙ্গে এক হয়ে উচ্চবিত্ত হিন্দু জমিদার শ্রেণীর অবজ্ঞা ও শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং মুসলিম লীগের সঙ্গে জোটও বেঁধেছিলেন। মুসলিম লীগের নেতা সলিমুল্লাহ-র সঙ্গে এ নিয়ে অনেক কথাও হয় শশিভূষণ ঠাকুরের। কিন্তু দেশ স্বাধীন এবং দেশভাগের ফলে মুসলিম লীগ নিম্নবর্গের হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে পারেনি। ফলে বিভিন্ন দাঙ্গা (১৯৪৬ নোয়াখালি দাদা - নমঃশূদ্রদের সঙ্গে), লুঠ, ধর্ষণ- এই সমস্ত অত্যাচারের ফলে সর্বস্ব ত্যাগ করে বলতে গেলে পালিয়েই লক্ষ লক্ষ হিন্দু কৃষিজীবী মানুষ চলে এল পশ্চিমবঙ্গে প্রাণ ও মান বাঁচাতে। কিন্তু এইসব প্রান্তীয় মানুষদের প্রাণ এবং মানের মূল্য এপারের ভারতীয়রা কোনোদিন দেয়নি। মুসলিম লীগ বিশ্বাসঘাতকতা করল আর অভিজাত জমিদারশ্রেণীর হিন্দুরা তো যুগ যুগ ধরে এইসব প্রজাদের উপর অত্যাচার ও অবজ্ঞা চালিয়েই এসেছিল। সেখানে দেশত্যাগীদের মধ্যে ৬০ শতাংশ ছিল অকৃষিজীবী হিন্দু। কিন্তু ১৯৪৯ সালের পর এই কৃষিজীবী নিম্নবর্গের মানুষরাও দলে দলে দেশত্যাগ করে চলে এল। কেননা কোনোভাবেই আর পূর্ববঙ্গে তারা থাকতে পারছিল না। অশোকাগুপ্ত তাঁর 'নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে' পুস্তিকায় গান্ধিবাদী ঠক্কর বাপ্পার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, "তপশিলী হিন্দুরা পরিশ্রমী শান্তিপ্রিয় ও ধর্মভীরু। সবচেয়ে মর্মান্তিক আঘাত এরা পেয়েছিল ধর্মান্তরিত করায় ও মেয়েদের সম্ভ্রমহানিতে।" তাই দেশভাগের ফলে এরা নিজস্ব ভূখণ্ড, সংহত রাজনৈতিক শক্তি হারিয়ে ছড়িয়ে পড়ল ভারতের নানান প্রান্তে নিজের শ্রম আর উৎকণ্ঠা সম্বল করে। এদের কোনো আত্মীয় স্বজন পশ্চিমবঙ্গে ছিল না। দ্বিতীয়তঃ এমন কোনো আর্থিক সম্বল ছিল না যে এপারে এসে জমিবাড়ি ক্রয় করে স্থায়ী বসতি গড়তে পারে। সুতরাং স্রোতের শ্যাওলার মত, এদেশের সরকারের অবজ্ঞামিশ্রিত দয়ার উপর নির্ভর করে ভেসে বেড়াতে হল। কখনো শিয়ালদহ স্টেশনে, কখনো রানাঘাট ক্যাম্পে, ধুবলিয়া ক্যাম্পে কোনোরকমে একটু মাথা গুঁজে পুলিশ, গুণ্ডাদের হুমকি এবং তারপর বাংলা ত্যাগ করে পশুর মত গাড়িতে করে দণ্ডকারণ্য, আন্দামান কিংবা নৈনিতালে চালান। তার ভাষাসংস্কৃতি, যতসামান্য সম্পদ সব ত্যাগ করে তাকে নির্বাসনে যেতে হল। হায়রে ভাগ্যের পরিহাস। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন- "আমি আন্দামানে রিফিউজি কলোনিগুলোও দেখেছি। দণ্ডকারণ্য মালকানগিরির বহুজনের সাজে কথা বলেছি, তাদের মধ্যে একজনও ঘোষ-বোস-মিত্তির- চ্যাটার্জি ব্যানার্জি-গাঙ্গুলি নেই। সেইজন্য কি এত অবজ্ঞা?" অথচ পশ্চিমবাংলায়

কলকাতা শহরের আশেপাশের প্রায় ১৪৯টি বস্তি যেগুলি জবরদখল করে বসতি করে গড়ে তুলেছিল উদ্বাস্তুরা সেখানে প্রায় নিম্নবর্ণের হিন্দু ছিল না বললেই চলে। নির্বাসিত নিম্নবর্ণের মানুষদের প্রতি এই দ্বিমাতৃসুলভ আচরণের ফলে তারা ঐসব দুর্গম অঞ্চলে বসতি স্থাপন মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। বারবারই বাংলার নরম মাটি-জল-হাওয়ায় ফিরে আসার চেষ্টা করেছে। এই দুর্বিষহ জীবনযন্ত্রণার কথা ধরা পড়ে একজন উদ্বাস্তু কবির গানে- "আমরা যারা বাস্তুহারা / একেবারেই সর্বহারা / তাদের অন্নচিন্তা চমৎকারা/তারা কেহ ঝোপে-জঙ্গলে/ কেহ বা তাঁবুর তলে / কেহ পড়ে তালবেতালে / আছে আজ নৈনিতালে।/ কেহ বা দুটো অন্নের জন্য/রয়েছে দণ্ডকারণ্য, কেহ বা বিনা খুনে / গিয়েচে আন্দামানে....।" এগারোশো উদ্বাস্তু নমঃশূদ্র বাঙালি পরিবারকে জাহাজযোগে আন্দামানে নির্বাসনেই পাঠানো হয়েছিল। তখনকার বামপন্থী নেতারা এর বিরুদ্ধে সরব হলে এরাই আবার ক্ষমতায় এসে বিরূপ আচরণ করে হাজার হাজার নিম্নবিত্ত বাঙালি রিফিউজিদের খুনও করেছিল। এটাই হল শাসকের ইতিহাস এর ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু ব্যতিক্রম হতে কি সত্যই পারে না? যেসব সাহিত্যিকদের সাহিত্যে এই নিম্নবর্গীয় বাঙালিদের দুঃখের কথা ধরা পড়েছে তাঁদের মধ্যে একজন হলেন- প্রফুল্ল রায়। তাঁর উপন্যাস 'নোনাজল মিঠেমাটি'তে এবং দু-একটি ছোটগল্পে এদের কথা উঠে এসেছে। 'নোনাজল মিঠেমাটি'তে জাহাজ থেকে নেমে ডেলা পাকিয়ে বসে থাকে একদল ভীত নিঃস্ব মানুষ। এ উপন্যাসে পালসাহাব একটি রহস্যময় চরিত্র। তিনি এদের অভিভাবকের মত বাসের ও চাষের জমির বন্দোবস্ত করে দেন। "পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী পারের মাটি হারিয়ে এসেছে মানুষগুলো। বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপে আবার তারা মাটি পেল।" এখানে আবার বাঁধল ঘর। ধর্ষিতা নারী কাপাসীর সঙ্গে হারানের মিলন হয়। দ্বীপে নতুন মানুষের জন্ম হয়। সুখে-দুঃখে- প্রেমে আর প্রাণের তাপে গড়ে তোলে উপনিবেশ। কিন্তু বাংলার মানুষ বাংলার মানচিত্র থেকে নির্বাসিত হল। বাংলা থেকে তাদের অস্তিত্ব লীন হয়ে গেল। দণ্ডকারণ্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রজেক্ট। সেখানেও উদ্বাস্তুদের নিয়ে রাস্তাঘাট সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার শ্রমিকের কাজে লাগালো। যারা ছিল নদীমাতৃক দেশের উর্বর জমির চাষী। সোনার ফসলের কারিগর তাদের দণ্ডকারণ্যে পাথুরে জমিতে জলহীন জায়গায় বসতি দিল। অশোকাগুপ্ত নামে একজন সমাজসেবিকা তাঁর 'In the Path of Service' গ্রন্থে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন, যারা ছিল 'deeply achored in the unique ecological setting of their deltaic homeland' তাদের এনে ফেলা হল 'terrible lack of infrastructure' -এর মধ্যে। এই অরণ্য-অঞ্চল ছিল প্রাচীন জনজাতির আদিনিবাস। নতুন বসতি গড়ে তুলতে অরণ্য কেটে পরিষ্কার করতে হচ্ছিল। ফলে

এদের উপর এখানকার প্রাচীন জনজাতি বিরূপ হয়েছিল। ফলে এই প্রতিকূল পরিবেশ থেকে নরম জলহাওয়ার কৃষিজীবী মানুষের মন ছিল সবসময় পালাই পালাই। অনেকে ফিরে পূর্ব-পাকিস্তানেও চলে গেছিল। কিন্তু পশ্চিমবাংলা তাদের একটু আশ্রয় দিতে পারেনি। সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যালের একটি উপন্যাস 'অরণ্যদণ্ডক'। এই উপন্যাসটিতে দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের জীবিকা ও বেঁচে থাকার জন্য যে কঠিন লড়াই করতে হয়েছে তার বিবরণ পাওয়া যায়। সত্যপ্রিয় ঘোষের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় তাঁর সাহিত্যে এই নিম্নবর্ণের মানুষের দূরাবস্থার কথা উঠে এসেছে 'বঙ্কু ঘরামির গল্প' রচনায়।

১৯৭৫ সালের জুন মাসে দণ্ডকারণ্য থেকে হাজার হাজার মানুষ আবার বাংলার বুকে (পশ্চিমবঙ্গে) একটু আশ্রয়ের জন্য ফিরে আসার উদ্যোগ নেয়। তৎকালিন রাজা সরকার তাদের হাওড়া স্টেশনে নামার আগে আবার ফিরিয়ে দেয়। তাদের স্বপ্ন ছিল সুন্দরবনের ৩৯ মাইল দীর্ঘ, ৮ মাইল চওড়া মরিচঝাঁপি দ্বীপে নিজেদের মত করে বাসস্থান গড়া। সরকারি কোনো সাহায্য তারা চায় না। শুধু এই দ্বীপটুকুতে তাদের বাস করার অনুমতি চাই। "Their love for West Bengal in alive as their hope about Dandakaranya is dead." দণ্ডকারণ্যের মানা ক্যাম্পেই প্রথম মরিচঝাঁপির আন্দোলন শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজরা সুন্দরবনের জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য খুলনা জেলা থেকে লোক এনেছিল এবং তারা অনেকেই আশপাশের দ্বীপে - কুমিরমারি, সাতজেলিয়া, ঝড়খালিতে বসতি স্থাপন করেছিল। ফলে অনেকের পরিচিত লোক ওই এলাকায় আছে বলে তাদের আগ্রহ আরো বেশি ছিল। কংগ্রেস সরকার অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের হাওড়া স্টেশনে নামতেই দেননি যেমন, তেমনি বিরোধী বামপন্থী রাজনীতির মানুষরা তাদের আশ্বস্ত করে, তারা ক্ষমতায় এলে বাংলায় তাদের ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু তারা ক্ষমতায় এল, কোনো কোনো মন্ত্রীর অলিখিত নির্দেশে উদ্বাস্তুরা মরিচঝাঁপি এসে নিজেদের অমানুষিক পরিশ্রমে বাঘ-কুমিরের সাথে লড়াই করে বসতি স্থাপনও করল। কিন্তু সংরক্ষিত সুন্দরবনের ক্ষতি হবে বলে তৎকালিন বামপন্থী রাজ্য সরকার তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচারে তাদের সেখান থেকে উৎখাত করে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে মরিচঝাঁপির কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে তিনি মন্তব্য করেন, "কিন্তু বিরোধীপক্ষে থাকা আর সরকারপক্ষে থাকার মধ্যে অনেক তফাৎ ঘটে যায়।" অনেক অনুনয় বিনয় করেছিল উদ্বাস্তুরা সরকারের কাছে। কেন্দ্রীয় সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সন্তোষকুমার মল্লিকের জবানে উদ্বাস্তুরা বলে, "আমরা কারো বোঝা হয়ে থাকব না। আমরা সম্পদ সৃষ্টি করব। এই ছোট মরিচঝাঁপি দ্বীপেই আমরা লক্ষাধিক লোকের জীবিকার

সংস্থান করতে পারব এবং পশ্চিমবাংলার বনসম্পদ আমরা বৃদ্ধি করে দেব।" ওরা বাঁধ দিয়ে মাছের চাষ করে। স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলে। টিবওয়েল বসায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের ওপর আবার বীভৎস অত্যাচার করে সেখান থেকে উৎখাত করা হয় বনসংরক্ষণের দোহাই দিয়ে। ১৯৭৯ সালের ৩১ জানুয়ারী পুলিশের গুলি, আগুন, কাঁদানে গ্যাস, বিভিন্ন উপায়ে আক্রমণ করে এই দ্বীপের বাসিন্দাদের নিধনযজ্ঞ করেছিল সর্বহারার সরকার। কত নারীকে ধর্ষণে করেছে রক্তাক্ত; আবার একবার হতভাগ্য প্রান্তীয় মানুষ ব্রিটিশের থেকেও ভয়ংকর সন্ত্রাসী শাসকের মুখোমুখি হ'ল।

মরিচঝাঁপির এক ইতিহাসসম্মত দলিল নকুল মল্লিকের লেখা 'ক্ষমা নেই' গ্রন্থখানি। দণ্ডকারণ্য থেকে ফেরৎ আসা কয়েক হাজার মানুষ প্রায় পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে তাদের স্বপ্নের দ্বীপ মরিচঝাঁপিতে গিয়ে বসতি গড়ে তোলে। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে তারা এখানে বাঁচার লড়াইতে মেতে ওঠে। দণ্ডকারণ্যেও তারা যে লড়াই করেনি তা নয়, কিন্তু সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন ছিল প্রতিকূল, তেমনি জঙ্গলের যে ভূমিপুত্র আদিবাসি সমাজ, তাদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছিল না এই নরম-জলহাওয়ার কৃষিজীবী মানুষগুলি। আর এমন পরিকাঠামোহীন জায়গায় তাদের বসতি এবং জমি দেওয়া হয়েছিল সেখানে 'করে-কর্মে' বেঁচে থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল এদের কাছে। এছাড়া ছিল ভাষার প্রতিবন্ধকতা। তাই পূর্বে দেখে যাওয়া নদী দিয়ে ঘেরা জলা বনাঞ্চলে এবং আশেপাশের সমভাষাভাষি স্বজনের পাশে বাংলার বুকে অধিক পরিশ্রম করেও আবার নতুন স্বপ্ন দেখেছিল পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে দেশভাগ এবং তার ফলে যে সংখ্যক মানুষরা বাস্তুচ্যুত হয়েছিল তাদের দায়দায়িত্ব নেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও স্বাধীন ভারতের সরকার দিয়েছে দয়া-করুণা-ঘৃণা আর বঞ্চনা ও অত্যাচার। সরকার পক্ষের বিরোধীরা এই বঞ্চিত মানুষদের উপর সমব্যথা প্রকাশ করে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, আর বিরোধীরা যখন সরকার পক্ষে অবতীর্ণ হয় তখন তাদের বিগত সরকারের রূপই দেখা যায়। কিন্তু যে নিকৃষ্ট চক্রান্তে বা ক্ষমতালিপ্সার ফলে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হয় এবং তার ফলে মানুষকে সর্বহারায় পরিণত করে সেই চক্রান্তের মূলচ্ছেদ হওয়ার কোনো প্রতিকার চেয়ে বিপ্লব গড়ে ওঠে না এদেশে। গড়ে ওঠে পুলিশ-পার্টি ক্যাডার দিয়ে অসহায় মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার। 'ক্ষমা নেই' উপন্যাসের মুখবন্ধ রচয়িতা অর্থনীতির অধ্যাপক ড. দিলীপ হালদায় মহাশয় মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি তাদের দূরবস্থা দেখতেও একসময় গিয়েছিলেন সেখানে। সেই অভিজ্ঞতার কথা একটু জানিয়েছেন এই গ্রন্থের মুখবন্ধে - "একজন অল্পবয়সী ঘরের বৌ আমাদের মধ্যে একজনকে উলটো দিক থেকে এসে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে

পড়ে 'আমার সোয়ামি কোনো অন্যায় করেনি, নদীতে নৌকোয় করে জল আনতি গেছে আর ফেরেনি। ওরে ফেরত দেন।" এই কথা বলে সে প্রায় সংজ্ঞাহীনের মত হয়ে পড়ে।... আর একজন বৃদ্ধার কোলে দেখলাম একটি রুগন শিশু যার পেটে মায়ের দুধ, কিংবা খাবার বা একটু জল কিছুই পড়েনি, হয়তো বাঁচবে না। বৃদ্ধা বললেন, 'এগুলোই মরে বেশি।' ওখানে খাবার জলের অভাব ছিল। নৌকোয় করে ওপার থেকে খাবার জল আনতে হত।" পুলিশ তাদের এই খাবার জলও আনতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। অধ্যাপক হালদার ওখানকার নেতৃত্বদের সাথে কথা বলেছেন এবং প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছেন "আপনারা এখানে এলেন কেন? কার কথায় এলেন? কী খেয়ে বাঁচবেন? রোজগারের উপায় কী?" নেতৃত্বদের মধ্যে একজন রঙ্গলাল গোলদার উত্তর দিয়েছিলেন- "আমরা এখানে আসছি তার একটা কারণ, আমরা আর কোথাও এইরকম নির্ঝঞ্ঝাট জায়গা পাই নাই। আর রামবাবু (রাম চ্যাটার্জি) আর কিরণময়বাবু (কিরণময় নন্দ) ও বলেছিলেন। অন্য কারণ হল এই আবহাওয়া জলবায়ু আমাদের চেনা। এখান থেকে সোজা পূব দিকে যদি চলে যান, মাইল পনেরো কুড়ি পর দেখবেন খুলনা। আমরা খুলনা, যশোর এইসব জায়গার মানুষ, জলে হাত দিয়ে বলতে পারব এখানে কী মাছ হবে। এই জমিতে কীভাবে ফসল ফলাতে হয় তা আমরা জানি। কয়েকটা দিন সবুর করেন বাঁধটা দেওয়া শেষ করি, তারপর দেখবেন আমাদের অবস্থা ফিরে গেছে।" এই রকম আশা নিয়ে যারা বুক বেঁধে এই মরিচঝাঁপিতে উপনিবেশ গড়েছিলেন তাঁদের উপর কী অমানুষিক অত্যাচার রাজ্যসরকার করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে নকুল মল্লিকের 'ক্ষমা নেই' উপন্যাসে।

নদীমাতৃক বাংলার সন্তানরা বাংলাতেই শতকষ্টে আমরণ কাটাতে চায়। তাই ভীষণ প্রতিকূল পরিবেশেও তারা বুক বেঁধে থাকে আগামী দিনের সোনালী দিনের আশায়। মরিচঝাঁপি দ্বীপে তারা যে আস্তানা তৈরি করেছিল, তার পরিচয় ঔপন্যাসিক নকুল মল্লিক দিয়েছেন - "করাণখালি নদীর পাড় বরাবর উঁচু বাঁধ দিয়ে আটকানো নদীর চরাভূমি, পরিপূর্ণ শুকায়না কখনও, জলকাদায় মাখামাখি। তার ভিতর ঝাউবন, ফাঁকে ফাঁকে নারকেল চারার সারি। কেওড়া, গেয়ো, গরান গাছও মাঝেমধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আছে গুল্মলতার ঝোপজাড়। তার ভিতর সারি সারি ছোট ছোট খড়পাতার ছাবড়া ঘর, একচালা, দোচালা, কোনো ঘর নৌকার ছই-এর মত গোল। তার ভিতর আলো বাতাস ঢোকে না, ঝড়বাতাসে অশক্ত চাল উড়ে যেতে পারে যে কোনো সময়। ক্ষুদ্রাকার ঘরের ভিতর মানুষের লম্বিত দেহটা সোজাসুজি ঢোকে না, নতজানু হয়ে প্রবেশ করতে হয়। সাধারণ জোয়ারে জল ঢোকে না ভিতরে কিন্তু কখনও সখনও বাঁধভাঙা জলের তোড়ে ঘরবাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

উঠোনের মাটি সর্বক্ষণ ভিজে থাকে বলে ঘরের ভিতরটাও স্যাঁতস্যাঁতে।" ('ক্ষমা নেই',পৃঃ ১১) চারিদিকে থৈ থৈ জল কিন্তু একটু পানীয় জলের অভাব। সারা দ্বীপে একটি-দুটি টিউব-ওয়েল আছে, সেখানে দিবারাত্রি জলের কাড়াকাড়ি। এছাড়া অন্য উপায় নৌকা নিয়ে নদীর ওপারে গ্রাম থেকে জল নিয়ে আসা। তাছাড়া এই উদ্বাস্তু মানুষের জীবিকারও কোনো নির্দিষ্ট বন্দোবস্ত নেই। নদীর মাছ ধরে

বিক্রি করা কিংবা দূরে গ্রাম বা শহরে অনিশ্চিত কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হয়। উপায় অন্তর কিছু না পেলে সুন্দরবনের গরান, কেওড়ার ডাল ভেঙে সেগুলি বাজারে বিক্রি করা। কিন্তু এর জন্য তাদের পোহাতে হয় পুলিশের ঝামেলা। মরিচঝাঁপির সকলে মিলে ভেড়ি করে মাছের চাষ করেছে, সেই মাছ একবার বিক্রি করার উপযুক্ত করে বাজারে ছাড়তে পারলে তাদের অনেক অভাব খুঁচে যাবে। এই আশায় আছে সকলে। কিন্তু সেদিন পর্যন্ত তাদের আর মরিচঝাঁপিতে থাকতে হল না, তৎকালিন রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার মিলে নারকীয় ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাদের উৎখাত করল। এখানকার মানুষের কিভাবে দিনাতিপাত হয় তার পরিচয় পাই উপন্যাসের চরিত্র মাধবের বৃদ্ধা মায়ের বর্ণনার মাধ্যমে। এখানকার অভিভাবকস্থানীয় মানুষ রাইহরণকে ডেকে বৃদ্ধা তার অবস্থার কথা জানায়- "বাপু, কী আর কবো তোমারে। আজ দুইদিন আমার নাতিডার মুখি কিছু দিতি পাল্লাম না। ঘরে কিচ্ছু নেই। ওর বাবা কয়েকখানা কাঠকুটো নিয়ে মোল্লাখালির হাটে গিলো বেচতি, তা পুলিশি কাড়েকুড়ে নিয়ে গেছে। সে বেটা তো খালি হাতে ফিরে আয়ছে। এহন আমরা খাব কী?... আমরা না হয় না খা'য়ে থাকলাম কিন্তু ঐ নাতিডারে বাচাবো কী করে। তার কথার ফাঁকে রাইহরণ জিজ্ঞাসা করেন বৌমা কাজে যাচ্ছে না? যাবে তো, কিন্তু পুলিশির ভয়ে যাতি পাত্তেছে না। গাঙ পার হলি মা'য়ে ছাওয়ালের কাছেতে ওরা নৌকা কা'ড়ে নিয়ে যাচ্ছে। গেরস্থ বাড়ির কাজ, দুদিন না গেলি আর থাকে না।" ('ক্ষমা নেই',পৃ: ১৩)- এই মানুষগুলির দেশে (পূর্ববঙ্গে) হয়তো গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ ছিল না কিন্তু কখনও এই নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর মত অবস্থায় পড়তে হয়নি। পণ্ডিত নেহেরু, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যে সহানুভূতি ও আশার বাণী শুনিয়েছিলেন দেশভাগের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মানুষের উদ্দেশ্যে, তার কোনো প্রতিফলন আমরা দেখতেই পেলাম না, শুধু প্রতিশ্রুতিই সার হয়ে রইল। পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন "রাজনৈতিক সীমারেখা যাঁদেরকে আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁরা সদ্যলব্ধ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছেন না, আমরা সেই ভাইবোনেদের কথাও স্মরণ করছি। ঘটনা যাই ঘটুক তাঁরা আমাদের এবং আমাদেরই থাকবেন। আমরা অবশ্যই তাঁদের সুখদুঃখের অংশীদার হব।" ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ বললেন- "যে সকল বাস্তুচ্যুত মানুষ আর্থিক

অনটনের মধ্যে অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করেছেন এবং এখনও করছেন আমরা তাঁদের সকলকেই পুনর্বাসন দেবার জন্য উদ্বিগ্ন।" সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল মন্তব্য করলেন- "যাঁদের সঙ্গে আমাদের রক্তমাংসের সম্পর্ক, যাঁরা একত্রে আমাদের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন, যেহেতু তাঁরা এখন একটি সীমারেখার ওপারে, সেই জন্যই হঠাৎ তাঁরা আমাদের কাছে বিদেশি হয়ে যেতে পারেন না। দক্ষিণ আফ্রিকার বসবাসরত ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিরা আফ্রিকার নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও আমরা এখনও তাঁদের সাহায্য করার চেষ্টা করি। তাঁদের সুনিশ্চিতভাবে আমাদের কাছে দাবি করার অদিকার আছে।" স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী বললেন- "হিন্দু এবং শিখ যাঁরা আটকে তাঁরা যদি আমাদের কাছে দাবি করার অধিকার থাকে তাহলে অপর অংশে যাঁরা আটকে আছেন তাঁদেরও যদি আর (ওখানে) থাকতে ইচ্ছুক না হন, তাহলে সম্ভাব্য যে কোন উপায়ে এখানে চলে আসতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রথম কাজ হবে তাঁদের জীবিকার জন্য কর্মসংস্থান করা, যাতে তাঁদের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়।" এই নেতৃত্বদের প্রতিশ্রুতিগুলি 'ক্ষমা নেই' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন ইতিহাস সম্মতভাবে।

এই প্রতিশ্রুতি দেশনায়করা দেওয়া সত্ত্বেও এই নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তুদের কোনো সুরাহা হয় না, স্রোতের শ্যাওলার মত ভেসে বেড়াতে হয়। বাস্তুহারা দুর্দশাগ্রস্ত নিপীড়িত এইসব মানুষদের জীবনের কঠিন চিত্র এবং তাদের প্রতি ভারতীয়দের অনীহা, অত্যাচার বারবার নেমে এসেছে তারই একটা ইতিহাসসম্মত দলিল 'ক্ষমা নেই' উপন্যাসটি। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীরাও এই শ্রেণীর মানুষদের প্রতি কোনো সাহায্যের হাত তো বাড়িয়ে দেয়ইনি বরং তাদের গুলি করে, লাঠিপেটা করে বাস্তুচ্যুত করে ছেড়েছে। পুলিশ ও গুণ্ডা দিয়ে নারীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে অতিষ্ঠ করে তুলেছে তাদের জীবন। একটু তৃষ্ণার জল এবং খাদ্য সরবরাহের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। এই মানুষদের তুলনায় সরকারের কাছে বাঘ-ভাল্লুকের মূল্য অনেক বেশি মনে হয়। উপন্যাসের একটি প্রতিবাদী মানুষ রঙ্গলালের কথায়- "... যারা একদিন আমারগে বাংলায় রাখার জন্যি আন্দোলন করেছিল, আজ ক্ষমতায় আসে তারাই আবার তাড়াবার চেষ্টা কত্তিছে।" ('ক্ষমা নেই', পৃঃ-৪৫) আসলে এরা পূর্ববঙ্গে মুসলিমদের কাছে ছিল সংখ্যালঘু, হিন্দুদের কাছে অস্পৃশ্য শূদ্র এবং বাংলার বাইরে বাঙালি। সুতরাং এই ত্রিদোষে স্বর্গে, মর্ত্যে,পাতালে এঁদের কোথাও ঠাঁই হয় না।

আসল কথা প্রকাশ পায় এই উপন্যাসের চরিত্র বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবী বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের বক্তব্যে "খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা আমরা চাইনি অথচ তাই আমাদের মেনে নিতে হল। তার পরিণাম স্থায়ী উদ্বাস্তু সমস্যা। আজ আপনাদের এই দুর্ভাগ্যের জন্য আপনারা দায়ী নন, দায়ী রাজনৈতিক ব্যবসায়ীরা, যারা দেশভাগকে

সমর্থন করেছিলেন, আপনাদের শোষণ করার জন্য। যথার্থ স্বাধীনতা হয়নি, হয়েছে কেবল ক্ষমতার হস্তান্তর; বাবাসাহেব আম্বেদকর সেদিন বলেছিলেন 'ভারত ভাগ আমি কোনোমতেই সমর্থন করতে পারি না। ভারত ভাগ হলে সমাজের নীচু তলার মানুষ বিশেষতঃ তফশিলী শ্রেণীর মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' আজ তিরিশ বছর আপনারা বাস্তুহারা, আরও কত তিরিশ বছর যাবে... আপনারা বাস্তু ফিরে পাবেন না, ঘর বাঁধতে পারবেন না। একমাত্র সমাধান জীবনপণ সংগ্রাম...।" ('ক্ষমা নেই', পৃঃ- ৭০-৭১)। মানুষগুলি সত্যিই জীবনপণ সংগ্রাম করেছিল। কিন্তু অসম পুলিশি শক্তির কাছে তাদের সংগ্রাম টিকতে পারে না। ক্ষতবিক্ষত হয়ে ছাড়তে হয় মরিচঝাঁপি। আবার তারা বাস্তুহারায় পরিণত হয়, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে আশ্রয় নেই বিভিন্ন জায়গায়। মরিচঝাঁপির স্বপ্ন চিরজীবনের মত ত্যাগ করতে হয় এই শূদ্রসম্প্রদায়কে।

এই মরিচঝাঁপির আখ্যানে বাংলা-বিভাজনের উত্তরকালের কথা। বাম সরকার ক্ষমতার প্রতাপ দেখিয়ে নিম্নবর্গীয় ও নিম্নবর্ণীয় উদ্বাস্তুদের শ্রম দিয়ে গড়া উপনিবেশ থেকে উৎখাত করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ওঁদের কথা দু-চারজন বিবেকবান সাংবাদিকের প্রতিবেদন ছাড়া অন্য কোথাও কোনো সাহিত্যে প্রকাশ পায় না। কেননা এ ইতিহাস নিম্নবর্ণের ইতিহাস। তাই তো কলম ধরতে হয় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ নকুল মল্লিককে, কলম ধরতে হয় মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তু আন্দোলনের কর্ণধার সতীশচন্দ্র মণ্ডলের সুযোগ্য পুত্র জগদীশ মণ্ডলকে। নিম্নবর্গীয় মানুষদের এই বেদনাময় জীবনের ছবি ভদ্রসমাজের লেখক-সাহিত্যিকের কলমে স্থান পায় না।

আর একটি নির্ভেজাল নিম্নবর্ণীয় উদ্বাস্তুদের জীবনযন্ত্রণার কথা পাই কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের 'উজানতলীর উপকথা' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে। স্বাধীনতার পরবর্তী ষাট বছরে এপার বাংলা - ওপার বাংলা মিলিয়ে বেশ কিছু উপন্যাস লেখা হলেও বাংলার জনবিন্যাস ও মনবিন্যাস বদলের গভীরতম চিত্র সেখানে তেমনভাবে ধরা পড়েনি। কিন্তু ঔপন্যাসিক কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর তাঁর এই উপন্যাসে ফরিদপুর জেলার একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের দেশবিভাগের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জীবন-যাপন এবং মানসিকতা ও ব্যবহারের পরিবর্তনের বৃত্তান্ত যেভাবে উপস্থিত করেছেন তা অন্য জায়গায় বিরল। ইতিহাসের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে যে উপাখ্যান বা ব্যক্তির তীব্র জীবনসংকট, তাই অতি বাস্তবসম্মতভাবে অতুলনীয় লেখনীতে সেই অন্তর্লীন চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক। ব্যক্তির সংকটই বড় হয়ে উঠলেও কোনও ব্যক্তির কাহিনী নয়, অস্থির সময়ের আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে একটা জনগোষ্ঠীর ট্র্যাজিক জীবনকে উপস্থাপিত করা এই উপন্যাসিকের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'উজানতলীর উপকথা' উপন্যাসের প্রথমখণ্ডে দেখা যায় অবিভক্ত পরাধীন ভারতবর্ষে পূর্ববঙ্গের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের নিম্নবর্ণীয়

মানুষদের (যারা হিন্দু সমাজে জল-অচল বা চণ্ডাল বা চাড়াল বলে উপেক্ষিত, ঘৃণিত) মধ্যে কীভাবে শিক্ষা-দীক্ষার আন্দোলন শুরু হচ্ছে। স্কুল-কলেজ তৈরী হচ্ছে এবং মানুষের মধ্যে উত্তরণের একটা স্পৃহা এবং কিভাবে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে হয় তা অত্যন্ত সুচারুরূপে প্রতিফলিত। কিন্তু দেশবিভাগের পরবর্তীকালে তারা প্রথমে ভাবতে পারেনি তাদের এই বাস্তুভিটা, স্বপ্নের গ্রাম, সোনার বাংলা ত্যাগ করতে হবে, হতে হবে উদ্বাস্তু, অন্যের দয়ার পাত্র, পথের ভিখারি। সমাজের অবজ্ঞা যুগযুগ ধরে সহ্য করে যারা গুরুচাঁদের শিক্ষা আন্দোলনের ফলে একটু আলোর মুখ দেখার অবস্থায় যখনই একপা অগ্রসর হল তখনই এই দেশভাগের আঘাত তাদের সবকিছুকে বিপর্যস্ত করে দিল। ১৯৪৯ সাল থেকেই ওপারের কৃষিজীবী নিম্নবর্গীয় মানুষদের দেশছাড়ার হিড়িক বেশি পড়েছিল অর্থাৎ পূর্ববর্তী এই দুতিন বছর তারা মাটি কামড়ে পড়েছিল যে, কোন ভাবে থাকা যায় কিনা। কিন্তু নিম্নবর্গের খেটে খাওয়া মুসলমানও তখন সুযোগসন্ধানী হয়ে উঠল।

নিম্নবর্গীয় হিন্দু-মুসলমানের যে একটা মিলের জায়গা ছিল সেই সম্প্রীতির বাঁধন আর টিকল না। ফলে দেশ ছাড়তে বাধ্য হল নমঃশূদ্র, সাঁওতাল, রাজবংশী, পঞ্চক্ষত্রিয়রা এবং চাকমারা। সব কিছু ফেলে চলে আসার যে অভিজ্ঞতা তার বর্ণনা দিয়েছেন ঔপন্যাসিক- "তিল ধারনের স্থান নেই বনগাঁ, বগুলা, মাজদিয়া, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, হিলি-সীমান্ত সংলগ্ন স্টেশনগুলিতে। মাঝে মাঝে লরিতে বোঝাই করে তাদেব পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে অস্থায়ী কোনো ক্যাম্পে, নয়তো বা ট্রেনের পেটে সেঁধিয়ে শিয়ালদায় নিয়ে উগরে ফেলা হচ্ছে। স্টেশন চত্বর ছাড়িয়ে কলকাতা শহরের ফুটপাতে থিক থিক করছে মানুষ। মাথা গোঁজার ঠাঁই দূরস্থান, নেই স্নান-শৌচাগারের সামান্য ব্যবস্থাও।... চারদিক জমা ময়লা ও বর্জ্যের দুর্গন্ধ।" ('উজানতলীর উপকথা', পৃ: ১৬-১৭)। এরপরই আরো কঠিন কথা বলছেন লেখক - "এরই মধ্যে খালি হয়ে যাচ্ছে কত মায়ের কোল। দেশান্তরের এই ধকল কেন সইতে যাবে দুই তিন মাসের, এমন কি এক-দেড় বছরের শিশুরাও? সুবিধে এই যে, তাদের জন্য চিতা বা কবরের দরকার হয় না। মায়ের বুকভাঙা হাহাকার ও স্বজনদের দীর্ঘশ্বাস ফুরোবার আগেই দূরবর্তী কোনো ঝোপে-ঝাড়ে, কালভার্টের নিচে তাদের কচি শরীরগুলিকে নির্মমভাবে ফেলে আসতে হয় শিয়াল ও শকুনের পরিতৃপ্তির জন্য।... ওই মৃত শিশুরা যেন এই হতভাগ্য দেশের সদ্য পাওয়া স্বাধীনতার স্মারক।" ('উজানতলীর উপকথা', পৃ: ১৭) স্টেশনে গভীর রাত্রিতে উদ্বাস্তুদের ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরীর এলিয়ে পড়ে, আর তার মধ্যে থেকেই এক প্রৌঢ়ার গলা থেকে নিঃসৃত হয় ব্যথার ছুরিতে ফালা ফালা করা এক অনুভবের সুর "অবুঝ মন আমার, / আমি ক্যান বা ছেড়ে এলাম রে বাড়িঘর।/ওরে বেনাপোলের ইস্টিশনে আমার কেড়ে নিল গলার হার।।"

('উজানতলীর উপকথা', পৃঃ ১৮) এই অনুভব শুধু গায়ক, গীতিকার- সুরকারের নয়, সকল বাস্তহারা মানুষের। উপন্যাসের একটি মুখ্য চরিত্র লেখাপড়া জানা যুবক কাজল। তার মুখে শুনতে পাওয়া যায় "আমাদের বুক তো কবেই ভেঙে টুকরো হয়ে গ্যাছে সুরেনদা। দ্যাশের নেতারাই যদি নিষ্ঠুর হয়, ঘরভাঙার আর ঘরে আগুন দেবার পুরোহিত হয়, আমাদের ভরসার জায়গা কোথায়? বাংলাভাগের আগে কত মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, পূর্ববাংলার সমস্ত হিন্দুর জায়গা হবে পশ্চিমবঙ্গে, তাদের দেখভাল করব আমরা, কারু কোনো দুঃখ থাকবে না। কোথায় গেল সে প্রতিশ্রুতি।... পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্যে সবাই ব্যস্ত। তাদের জন্য জমি, বাড়ি, ব্যবসা, ক্ষতিপূরণ সব আছে। এদের কথা কেউ ভাবে না। এরা হল দুয়োরানীর সন্তান। স্বাধীনতার সব মূল্য চোকাতে হলো এদেরই।" ('উজানতলীর উপকথা', পৃঃ ১৯) আর এক মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত পাই বনগাঁ স্টেশনে এক উদ্বাস্তু মায়ের মৃত্যু হলে তার সৎকারের প্রসঙ্গে। একদিকে ক্যাম্পে যাবার জন্যে লরি অপেক্ষা করছে অন্য দিকে মৃত মায়ের সৎকার করার দায়িত্ব। এই গুরুদায়িত্ব পালন করেছিল যুবক লোককবি সুরেন এবং কাজল। এ প্রসঙ্গে কবি সুরেনের একটি উক্তি উল্লেখ করা প্রয়োজন - "কে একজন যেন মৃতার ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, ওর গলায় একটা ধড়া বন্ধনের দরকার আছিল না? ধড়া! ঘুরে দাঁড়িয়ে সুরেন বলেছিল, ধড়ার আর দরকার নাই। গুরুদশার থেকেও অনেক বড় দশাই তো চলতিছে এখন। ধড়চূড়া কেনার পয়সাই বা কোথায়? পায়ের তলায় মাটি নাই, তাগের আবার শাস্ত্র-পুরাণ, আচার-বিচার। কপালগুণে মা-টা তবু বাংলার মাটিতে ঠাঁই পাইছে। আপনারা যে কোথায় যাবেন তার ঠিক আছে।" ('উজানতলীর উপকথা', পৃ: ২৫) যেমন পথেঘাটে অনাহারে জ্বরা ব্যাধিতে মরেছে অজস্র শিশুবৃদ্ধ তেমনি নির্মম অর্থগৃধু দুষ্কৃতিদের দৌরাত্মে হতে হয়েছে স্বজনহারা। কাজল যেমন তার মনের মানুষকে হারিয়েছিল, তেমনি রঘুবর হারিয়েছিল তার স্ত্রীপুত্রকে। বেনাপোল বর্ডারে একদল দুষ্কৃতি চেকিংয়ের নাম করে রঘুবরকে ডেকে নিয়ে যায়, আর এই সুযোগে অন্যদল তার স্ত্রীর কানের দুলের লোভে হয়তো তাকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে সব লুঠ করে ছেড়ে দিয়েছে। এই অচেনা জায়গায় দিশাহারা হয়ে তারা কোথায় চলে যায় শত চেষ্টা করেও রঘুবর পায় না স্ত্রীপুত্রকে। তাই আজও রঘুবর ভবঘুরে হয়ে খুঁজে বেড়ায় তার পরিবারকে। সে একটা খরিদ্দার নিয়ে তার কণ্ঠে বিষাদের সুর তুলে আকাশ-বাতাস আর সমগ্র উদ্বাস্তু মানুষের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। তার কণ্ঠেও শোনা যায় "অবুঝ মন আমার/আমি ক্যান বা ছেড়ে এলাম রে বাড়িঘর।/ওরে, বেনাপোলের ইস্টিশনে আমার কেড়ে নিল গলার হার।।" কিংবা কখনো মরমিয়া কবি বিজয় সরকারের গান "ও দরদিয়া রে, আমি কোন দ্যাশে যাব তোর লাগিয়া রে/আমার জীবনে মরণে সুখ নাই ও মুখ না হেরিয়া রে।।"

('উজানতলীর উপকথা', পৃ: ১৬০-১৬৯)। এভাবেই বাংলার গ্রাম শহর তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ায় রঘুবর তার স্বজনকে।

ওপার বাংলার এই নিম্নবর্গীয় কৃষিজীবী শ্রমজীবী মানুষরা যেভাবে নিজভূমে কঠিন পরিশ্রম করে একটু আগামী দিনের সোনালী স্বপ্ন দেখেছিল সবাই পরিশ্রম করে সংসারটাকে দাঁড় করাতো, তার মধ্যে এক আনন্দ ছিল, অসম্ভ্রমের কোনো প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু উদ্বাস্তু হওয়ার ফলে মানুষকে এমন বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে যেখানে তাকে প্রতিপদে পদে অপদস্থ হতে হয় অন্যের কাছে। তবুও পেটের দায়ে ঘর-বাহির সব এক করে ফেলতে হয়েছে। এমন এক করুণ পরিণতির বিবরণ আছে এই উপন্যাসে বিরাজ মাস্টারের পরিবারের। দেশে বিরাজ-মাস্টার তার আদর্শ নিয়ে শিক্ষকতা করেছে। দিন-রাত এক করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দরদ দিয়ে শিক্ষা দেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। দেশত্যাগ করে দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে অন্নকষ্টে নিজে যক্ষ্মার রোগীতে পরিণত হয়ে মানসিক বিকার এসেছে। স্ত্রীকে অবলম্বন করতে হয় ভেণ্ডারি পেশা। যেখানে প্রতিনিয়ত তাকে লড়াই করতে হয় কোনোরকমে দুটি পয়সা রোজগারের জন্য। যেমন পরিশ্রম তেমনি লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে তাকে দুটি টাকা রোজগার করে আনতে হয়। আজও এমন অনেক মহিলাকেই ঠাকুর-নগর-বনগাঁ থেকে ফুল-সব্জি নিয়ে এই ভেণ্ডারি করতে হয়। তাদের ট্রেনের অন্যযাত্রীরা অন্য নজরেই দেখে। দেশভাগ এই মানুষদের অন্য শ্রেণীর মানুষে পরিণত করেছিল। তাই সব মিলিয়ে 'উজানতলীর উপকথা" উপন্যাসটি নিম্নবর্ণীয় উদ্বাস্তু জনজীবনের এক বাস্তব ছবির কোলাজ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে সুচারুরূপে।

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেশভাগ স্মৃতি আর সত্তা' গ্রন্থের পরিশিষ্ট-১ (পৃঃ ৪৭) 'অভিশপ্ত অতীত' শিরোনামে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর উদ্বাস্ত্রজীবনের যে অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে তার কিছুটা অন্ততঃ উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজন। এই নিম্নবর্গীয় নমঃশূদ্র বাঙাল চাঁড়ালদের ভাগ্যে সরকারের কেমন দাক্ষিণ্য তার কঠোর বাস্তব পরিচয় পাওয়া যাবে এই অংশে - "আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয় বাঁকুড়া জেলার শিরোমণিপুর ক্যাম্প (ক্যাম্পটি ছিল বিষ্ণুপুর শহর থেকে ৭/৮ মাইল দূরে)। হাত দশেক লম্বা আর হাত পাঁচেক চওড়া লাল তাঁবুর মধ্যে গুঁজে দেওয়া হয় এক একটি পরিবারকে। পেটে কিছু গোঁজবার জন্য দেওয়া হতে থাকে প্রতি চৌদ্দ দিন পরে কিছু চালের মতো জিনিস আর কিছু টাকার মত জিনিস। সেই চালের মতো জিনিস দিয়ে ভাত রান্না করলে কেমন একটা টকটক গন্ধ ছাড়ত – খেলে পেটে মেঘ ডাকত। শোনা যায় একই গুদাম থেকে নাকি তিন গাড়ি চাল বোঝাই করে একটা চিড়িয়াখানায়, একটা জেলখানায় আর একটা আমাদের ক্যাম্পে চলে আসত।

এমনিতে বাঁকুড়া গরম জেলা। সেটা কোনো দোষের নয়। রোদে তাঁবু অধিক গরম হয় – সেটাকেও কোন দোষ দেওয়া যাবে না। দোষ ছিল, শূন্য (?) থেকে বছর পাঁচ-সাতেকের বাচ্চাগুলোর। মোটেই গরম সহ্য করতে পারত না। পটাপট মুরগির মতো দাপিয়ে মরে যেত। হাজারখানেক মানুষের পরিবার নিয়ে শিরোমণিপুর ক্যাম্পে মৃত্যু যেন তা থৈ নৃত্য করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল কয়েক বছর ধরে। রোজ রাতেই কোথাও-না কোথাও শিশুহারা মায়ের বুকফাটা কান্নায় পরিবেশটাকে ভয়ার্ত আর অসহ্য করে তুলত...." এই বুকফাটা কান্না রাষ্ট্রনেতাদের কানে পৌঁছত না এবং পৌঁছলেও তাদের বুকে কোনো কম্পন হত কিনা বলা মুশকিল।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডার গবেষক রশ মল্লিকের ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে The Journal of Asian Studies-এ প্রকাশিত "Refugees Resettlement in Forest Reserves: West Bengal Policy Reversal and the Marichjhapi Massacre" প্রবন্ধের ভাষায় এই মানুষগুলি 'untouchable and others marginalized People' সুতরাং কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় মরিচঝাঁপির ঘটনা নিয়ে 'ঠাকুরমার ঝুলি' কবিতা লেখেন-

এ-দুয়োর যায়: দূর দূর।
ও-দুয়োর যায়: ছেই ছেই।"

কিংবা, "পাথর-চাপা কপাল যার সেই / ঘুঁটে কুড়োনির ছানা' বা 'ঢোল ডগরে পড়ে লাঠি / রক্তে হয় রাঙা মাটি / কাড়ে না কেউ রা / ভালুমানুষের ছা।"

শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিতায় সরকারের আচরণ সম্পর্কে লিখলেন-"তুমি বললে মানবতা / আমি বললে পাপ... / তুমি বললে হিটলারি-ও/জনপ্রেমে ভরা.../ তুমি বললে বাঁচার দাবি /আমি বললে ছুতো.../ তুমি বললে দণ্ডকে নয়/আপন ভুমিই চাই / আমি বললে ভণ্ড কেবল/ লোক খ্যাপাবার চাঁই।/... তুমি বললে, বিপ্লব, আর/আমি প্রতিক্রিয়া।"

দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের নিয়ে শক্তিপদ রাজগুরু তাঁর 'দণ্ডক থেকে মরিচঝাঁপি' উপন্যাসে লিখেছেন এই নিম্নবর্ণের উদ্বাস্তুদের আশা-নিরাশার কথা। আট বছর ক্যাম্পে নিষ্কর্মা জীবনযাপনের পর তাদের নিয়ে যাওয়া হয় পুনর্বাসনের জন্য গ্রামে। জমি পেয়ে রামানুজ শরৎ-নিশিকান্ত-রামগতি মাঠে নামে লাঙল নিয়ে। খুঁজে পায় হারানো জীবনের সুর-ছন্দ। কিন্তু সুধাকান্ড, হরিশ পালদের শয়তানিতে আদিবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে তাদের মন ভেঙে যায়।

"আমাগো পশ্চিমবাংলায় পাঠাই দ্যান। বাঁচি মরি হেই মাটিতেই মরুম। কিংবা, "মরা-মাটি-জল কুনোদিন আইব না।"

গিরিজা-কেতকী খোকনকে নিয়ে সংসার গড়ে তুলেছিল। কিন্তু নিশিকান্তের কথায় তারাও দণ্ডকারণ্য ছাড়ে। মরিয়া উদ্বাস্তুরা মরিচঝাঁপি চলেছে। পুলিশের বাধাও তারা মানে না। বাঘের গর্জন, কুমিরের তোয়াক্কা না করে গাং দেখে, জল দেখে মুগ্ধ হয় তারা। দণ্ডকারণ্য কেন ছেড়েছেন প্রশ্ন করলে খ্যাপা নিশিকান্ত জবাব দেয়, "ক্যান আইছি? মরণের জন্যি! দ্যাশের মাটিতেই শ্যাষ শয্যা নিমু।"

দেশভাগের পরিণামে উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপির মর্মান্তিক আখ্যান প্রাধান্য পেয়েছে অমিতাভ ঘোষের ইংরেজি উপন্যাস 'The Hungry Tide'-এ। এই উপন্যাসে দুটি কাহিনির একটি কাহিনি অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টারমশাই নির্মলবাবুকে নিয়ে। ব্যর্থ কবি সে আজও বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে। স্ত্রী নিলীমার সমাজসেবামূলক কাজে তার কোনো আস্থা নেই। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের উপনিবেশ নির্মাণের কাজে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি সেই বিবরণ লিখে গেছেন পরবর্তী প্রজন্মের কানাইয়ের জন্য। নির্মলের মৃত্যুর পর সেই লেখা কানাইয়ের হাতে আসে। গ্রাম্য গরীবদের মধ্যেও যারা গরীব, "oppressed and exploited both by the Muslim communalists and by the Hindus of the upper caste." এরাই দণ্ডকারণ্যে আশ্রয় পেয়েছিল। সেখানে তারা থাকতে পারেনি। মরিচঝাঁপি চলে আসে দণ্ডকারণ্যের কঠিন মাটি ছেড়ে; কিন্তু সরকার আবার তাদের বাস্তুহারা করে ছাড়ে। নির্মলের মত সদিচ্ছাপরায়ণ, তত্ত্বে-বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী কিছুই করতে পারে না। কুসুমের মনে হয় সারা দুনিয়াটাই আজ পশুদের জন্য সংরক্ষিত "Our fault, our crime. was that we were just human beings." সুতরাং মানুষের চেয়ে বনের পশুদের সংরক্ষণের প্রয়োজন বেশি হয়ে পড়ে। তাই পরিশেষে বলা যায় যে দেশভাগের ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি হিন্দুদের যে দুর্দশা হয়েছিল তার মধ্যে নিম্নবর্গীয় হিন্দুরা সবথেকে বেশি শিকার হয়েছিল এবং আজও তাদের সেই ঘা শুকোল না। কিন্তু এই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে যেকথা বলা প্রয়োজন যে এদের সেই বেদনার কাহিনি নিয়ে বাংলা সাহিত্য আরো সমৃদ্ধ হতে পারতো। তবে আশা রাখছি আগামী দিনে গবেষণাধর্মী সাহিত্য এদের নিয়ে রচিত হবে। আর সত্য ইতিহাস মুখ লুকিয়ে থাকবে না। জগদীশচন্দ্র মণ্ডলের 'মরিচঝাঁপি : উদ্বাস্তু কারা এবং কেন?" গ্রন্থের শেষের দিকে উল্লিখিত সুশীল পাঁজার '১৯৪৭ এর বাঙালি আজও উদ্বাস্তু' কবিতা দিয়ে আলোচনা শেষ করছি-

আটাত্তরের অনেক মানুষ, মানুষের পাশে

বেঁচে আছে আজও পশুর মতো
অন্ধকার গলিতে আছড়ে পড়ে, ভোরের স্নিগ্ধ আলো
স্যাঁত স্যাঁতে আস্তানায় ভেজা শরীরে ঘুমোয়
ভাঙা সংসার
লজ্জা নেই, কিছু নেই তবু বেঁচে আছে
ক্ষুধার্ত শরীর
আর এদের ঈশ্বর থাকেন জরাজীর্ণ শিশুর কপালে
ওয়ালাস বস্তিতে ঘুমিয়ে যান মহামান্য বিদেশী মুকুট
আর গ্রামের ফসলের কথা ছাপা হয় প্রভাতী
সংবাদপত্রে
তবুও ছিন্নমূল মানুষ বাঁচতে থাকে পসুর খোঁয়াড়ে
আটাত্তরে উদ্বাস্তু আসে পশুদের শহরে
উলঙ্গ বাতাসে কাঁপে রাজসিংহাসন
সভ্যতার আলোর পিছনে ক্রুরতা
তাত্ত্বিক নষ্টামির যুদ্ধ
আটাত্তরের আগুনে পুড়তে থাকে বাংলার
প্রতিটি সবুজ গাছপালা...।"

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। উজানতলীর উপকথা- কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর নিখিল ভারত কলকাতা- ১২৭
২। কেন উদ্বাস্তু হতে হলে- শ্রীদেবজ্যোতি রায় বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র - কলকাতা -৭৩
৩। দেশভাগ স্মৃতি আর সত্তা- সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় -প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স -কলকাতা-৭৩
৪। বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন- তাপস ভট্টাচার্য- পুস্তক বিপণি -কলকাতা-৯
৫। ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য -অশ্রুকুমার সিকদার- দে'জ পাবলিশিং- কলকাতা-৭৩
৬। মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তু : কারা এবং কেন- জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল – বঙ্গদর্পণ প্রকাশন – কলকাতা-১৫০
৭। ক্ষমা নেই - নকুল মল্লিক- দলিত সাহিত্য সংসদ কলকাতা-১২৭